Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 407 – 413
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ধ্বংস প্রায় মুর্শিদাবাদ জেলার পটচিত্র : একটি ঐতিহাসিক আলেখ্য

অরিন্দম মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক
কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
Email ID : arindam05071979@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Patua, Patachitra, Murshidabad, Painting, Cloths, Religious, Histotical, Mythology, social- issue.

Abstract
From the medival period of Indian history, Murshidabad district bears the tradition of heterogenerous character. Murshidabad district is lying between 23°43'N and 24°52' N latitude and 87°49'E and 88°44' E longitude. It is situated on the left bank of Ganges and gradually becoming most populated district. The census of India, district census handbook of Murshidabad series disclosed a remarkable issue that 66.3% of Islam community and 33.2% Hindu by religion. From the long past Murshidabad district has a traditional and mythological heritage. The word pata is derived from the Sanskrit word patta that means clothes or cotton clothes. A probe into the folk culture of Bengal, particularly a peep within the patachitra tradition reveals that cloth painting was widely practiced. Traditionally, pata means a distinct style of painting either on paper or cloth. At one time patas were painted on jute based, the base was made plain by adding mud, clay and dung and after having dried paintings were done on them. Patachitra is a traditional painting of Bankura, Purulia, Birbhum, and Murshidabad district of West Bengal. It is based on Hindu mythology. Kalighat patachitra is inspired by kali and Hindu Brahmana sect. All colours used in painting on pata are natural and paintings are made completely old traditional way by patua or Patachitrakars in Murshidabad district. The Patachitra painting follows a traditional process of preparation of canvas. First the base is prepared by coating the sackcloth with the soft, white, stone, powder of chalks and glue made from tamarind seeds. The tools used in the process of painting are brush, locally known tuli, container, matka etc. The themes of the patas of Murshidabad district are historical, social reformative, religious and secular. Patuas or Patachitrakars are now in very bad condition both from socially and economically. Patachitrakars of Murshidabad district reveals the social issues like polio, malaria, B.C.G vaccine, traffic rules etc on their Patas. like Anu Patua, Kanchan Chitrakar, Basudev Mandal, Birinchi Patua are struggling their lives with patachitra and till are trying to vitalize this traditional art.

Discussion

স্বাধীনতার বহুপূর্ব থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার জনবিন্যাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনঘনত্ব বেশ বেশি। উপরন্তু এই জেলার সাথে অবিভক্ত বাংলাদেশের ভূ-মানচিত্র সরাসরি যুক্ত। শুধু তাই নয়, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাঁদে ভারত ভাগের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাতে মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ব পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত হয়েছিল। যদিও স্বাধীনতার তিনদিনের মধ্যেই এই জেলা ভারতবর্ষের সাথে জুড়ে যায়। ২০১১ খ্রিঃ জনগণনায় মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যার যে মানচিত্র পাওয়া যায় তাতে ৬৬.৩% ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং ৩৩.২% হিন্দু ধর্মাবলম্বী।[১] মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত খুব অল্প কিছু পটুয়া সম্প্রদায়ের বাস পরাধীন ভারত থেকেই লক্ষ্য করা যায়। পটুয়া সম্প্রদায় সংখ্যায় কম হলেও তাঁদের শিল্পকর্ম দিয়ে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার মানচিত্রে নয় সারা বাংলায় স্বতন্ত্রতা ও সুসংস্কৃতির সাক্ষ্য রেখেছিল যা বাংলাদেশে উৎকৃষ্ট লোক-সংস্কৃতির ধারকও বটে। পটচিত্রের পরিচয় নানা পুঁথিপত্র থেকে পাওয়া গেলেও ভারতে চিত্র লিখন ও চিত্র অঙ্কন অতি প্রাচীন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে যমপট ব্যবসায়ী-র কথা যেমন আছে তেমনি বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকেও যম পটের উল্লেখ আছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ও মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকেও চিত্র লিখন, অঙ্কন ও প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। মধ্যযুগের রূপ গোস্বামী ও গোপাল ভট্টের লেখনীতেও পটশিল্প ও পটুয়াদের কথা জানা যায়। তবে প্রাচীন পটচিত্রে পরলোকের জীবনকাহিনীর ধারণা পাওয়া যায়। বাংলার পটুয়ারাও পটে যম, যমালয় ও নানান ভয়ঙ্কর দৃশ্য এঁকেই গানের মাধ্যমে তা উপস্থাপনা করতেন। বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে পটচিত্রের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় প্রাচীন বাংলায় কাপড়ের উপর চিত্র বা ছবি আঁকার রীতি ছিল। সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ বস্ত্র বা সুতির কাপড়। বিখ্যাত লোক-সংস্কৃতি চর্চাকার গুরুসদয় দত্ত বলেছেন-

> "যে বস্ত্র বা সুতির কাপড়ের উপর ছবি আঁকা হত বা লেখা হত, সেই কাপড়টিকে পট বলা হত।"[২]

সাধারণ অর্থে পট বলতে বোঝায় কাপড় বা কাগজের উপর বিশেষভাবে আঁকা বিশেষ গুণসম্পন্ন চিত্র বা ছবি। একটা সময় ছিল যখন পটচিত্র আঁকা হত চটের উপর। কাদা-মাটি ও গোবরের মিশ্রণ দিয়ে পাটের চট বা বস্তার উপরে মসৃণ করা হত। রোদে শুকিয়ে নিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হত। এই চট ছবি বা চিত্র অঙ্কনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে বলে চটের পরিবর্তে শিল্পীরা কাপড় বা তুলট কাগজকে বেছে নেয়।[৩] যাঁরা পট লেখেন, চিত্র অঙ্কন করেন তাঁরা পটুয়া নামে পরিচিত। বাংলার বিশেষ কয়েকটি জেলাতে বাংলা শব্দের উচ্চারণ রীতি আঞ্চলিক ও ভিন্ন হওয়ায় কোনো কোনো এলাকায় পটুয়াদের পউট্যা, পউটা, পেটো, পটকার বলেও ডাকা হয়। পটুয়ারা নিজেদের চিত্রকর জাতি বলে পরিচয় দেয়। তবে অনেক মৃৎশিল্পীও ছবি আকার কাজ করে। বর্তমানে কাপড়ের উপর চিত্র ফুটিয়ে তোলার থেকে বেশি পটচিত্র আঁকা হয় কাগজের উপর।

কিংবদন্তী অনুযায়ী পটুয়ারা হলেন দেবতা বিশ্বকর্মার বংশধর। মহাদেব শিবের বিনা অনুমতিতে তাঁর ছবি আঁকার পর পটুয়াদের আদিপুরুষ তা গোপন রাখার জন্য তুলি মুখে পুরে রাখেন। তবে মহাদেব তা দেখে ফেলেন। তুলি এঁটো করার অপরাধে মহাদেবের অভিশাপই পটুয়াদের উৎপত্তি। তখন থেকেই তাঁরা মুসলমানের রীতি ও হিন্দু ধর্ম পালন করতে আদিষ্ট হয়। কাঞ্চন চিত্রকরের মতে তাঁরা একদিকে মুসলিমদের রীতি অনুযায়ী নামাজ পড়ে। অন্যদিকে হিন্দু দেব-দেবীদের ছবি এঁকে তাঁদের একটি মহিমা তুলে ধরেন।[৪] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পটুয়া চিত্রকর জাতির উদ্ভব নিয়ে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবেশি বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যা অস্পরা ঘৃতচীর গর্ভে নয় পুত্রের জন্ম হয়। এই নয় পুত্রসন্তান হলেন – কুম্ভকার, কুন্দিবক, শঙ্খকার, কর্মকার, মালাকার, কাংশ্যাকার, স্বর্ণকার, চিত্রকার ও সূত্রধর। এই নয় পুত্রের মধ্যে চিত্রকর হলেন পটুয়াদের আদিপুরুষ। ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট চিত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বতন্ত্র চিত্ররীতি অবলম্বন করায় ব্রহ্ম শাপে তাঁরা জাতিতে পরিণত হয়েছে। তখন থেকেই তাঁরা না হিন্দু, না মুসলমান। আসলে তারা এক নিচু প্রান্তিক জীবন যাপন করে চলেছে। এরা নামাজ পরলেও এদের নাম হিন্দুদের মতই। পটুয়াদের সাথে মুসলমান রীতিনীতির বহু মিল থাকলেও এঁদের মধ্যে হিন্দুদের অনেক আচার পদ্ধতি বিদ্যমান। তাই অনেকে পটুয়াদের বৌদ্ধ বলে অভিহিত করে।[৫]

পটচিত্রের বিভিন্নতা, বিষয়বস্তু ও আকার অনুসারে পটকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) আকৃতির দিক থেকে ও খ) বিষয়বস্তুগত। পটের আকৃতি খুব ছোট আবার খুব বড় হতে পারে। তাই আকৃতির দিক থেকে পটকে একচিত্র যুক্ত ছোট পট যা কালীঘাটে বেশী পরিমাণে দেখা যায়। এগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। একে চৌকপটও বলা হয়। আবার পর পর অনেকগুলো চিত্র নিয়ে আঁকা পট যেগুলোকে দীর্ঘপট বলা হয়। বহুচিত্রযুক্ত দীর্ঘ পটগুলিকে অবলম্বন করে পটুয়ারা গান রচনা করেন এবং নিজেরা সুর দিয়ে সেই গান গ্রাম সমাজে পরিবেশন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলায় পটুয়াগণ ৮-১০ হাত এবং ২০-২৫ হাত দীর্ঘ কাগজের উপরের বহু ছবি এঁকে কাহিনীযুক্ত পট তৈরী করেন। দীর্ঘ পটের দুই প্রান্তে বাঁশের দণ্ড লাগানো হয় যার সাথে পটটি জড়িয়ে থাকে। গান অনুসারে একপাশে খুলতে থাকে অন্যপাশে জড়াতে থাকে। জড়ানো পটের ছবি ও গান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।[৬] চৌকো পটের উদ্ভবের সাথে ১৭ শতকের কালীঘাটের মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক আছে বলেই মনে করা হয়। কালীর শহর কোলকাতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা'কালী-র মন্দির ঘিরে বাড়তে থাকে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা। তীর্থযাত্রীদের হাত ধরেই বিকশিত হয়েছে কালীঘাটের পটচিত্র। প্রথমদিকে দেবদেবীর চিত্রলেখা পটের বিষয়বস্তু হলেও পরে সামাজিক বিষয়ও পটে জায়গা পেয়েছে। উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজের নানান বিষয় এই পটচিত্রে ফুটে উঠেছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার পটগুলি অধিকাংশই দেব-দেবী ও তাঁদের মহিমা কীর্তন নিয়ে গড়া।

সুমনা দত্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্ব ভারতের পটচিত্র বই-তে পটকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল – ক) ধর্মীয় পট, খ) ধর্মনিরপেক্ষ পট –যার মধ্যে সমসাময়িক ঘটনাবলী জায়গা পেয়েছে। গ) ঐতিহাসিক পটয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক রাজ-রাজার যুদ্ধের কাহিনী বা বিশেষ যাত্রার কাহিনী থাকে, ঘ) সমাজ সংশোধনমূলক পট এবং ঙ) বিচিত্র পটের উল্লেখ তিনি করেছেন। তবে বারিদবরণ ঘোষ পটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– পৌরাণিক, প্রকৃতিযুক্ত ও স্থিরচিত্র, প্রতিদিনের চিত্র, ঐতিহাসিক ও ব্যঙ্গচিত্র।[৭] মুর্শিদাবাদের পটচিত্রকেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) বিভিন্ন উপজাতি যেমন সাঁওতালদের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁদের প্রচলিত যাদুপট বা চক্ষুদান পট ইত্যাদি চিত্রকলার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। খ) যমপট- যা মূলত মৃত্যুর পর যমরাজার বিচার বিষয়ক, গ) গাজিপট- এটি মূলত ধর্মীয় গুরু গাজী, ফকির, দরবেশদের বীরত্ব বিষয়ক পটচিত্র, ঘ) হিন্দু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, চৈতন্য লীলাসহ নানান হিন্দুধর্ম বিষয়ক রূপকথার কাহিনী বিবৃত হয় এই পটচিত্রের মধ্য দিয়ে।[৮] এছাড়াও বর্তমানের সমাজ সচেতনতা বিষয়ক বা বাস্তবধর্মী বিষয়ক পটচিত্রও বেশ দেখা যায়। এগুলির মধ্যে অতি সাম্প্রতিক কন্যাশ্রীর পট বা করোনা মহামারীর পট বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার এই পটচিত্র শিল্পীদের সমাজ চেতনায় পোলিও, ম্যালেরিয়া, বি.সি.জি টিকাকরণ, ট্র্যাফিক নিয়ম, নেশার দ্রব্যের কুপ্রভাব, পণপ্রথা, শিশু বিবাহ, স্বাক্ষরতা অভিযান, ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার প্রয়াস সাধুবাদ যোগ্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের রাজু পটুয়া, পাতু পটুয়াদের মত বহু পটুয়া শিল্পীরা সমাজকে সুশীল করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আর্থিক দৈনত্যা বর্তমানে তাঁদেরকে গ্রাস করেছে।

যমপটের যমরাজের বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তির নরক যন্ত্রনা আর পাশাপাশি পূণ্যবান ব্যক্তির স্বর্গসুখের কাহিনী তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ ইহজীবনে ন্যায় কাজ করলে পরজীবনে তার পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গলাভ করা যায়। এই বিষয়গুলি পটুয়ারা তাঁদের দক্ষ হাতে রং তুলি দিয়ে তুলে ধরে গান বাঁধেন। অশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার চিত্রকলা' গ্রন্থে বলেছেন অনেক সময় যমপটের চিত্র ভাবনা ও গানের কথাগুলি অমার্জিত রূপে পরিবেশিত হয়।[৯] তবে চক্ষুদান পটে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার আদিবাসী চিত্রকররা সাঁওতালী উপকথার ভিত্তিতে সাঁওতালদের জন্মকথা তুলে ধরে মূলত ভূমিজ, ভেদিয়া, সাঁওতাল উপজাতি পরিবারের জীবন কাহিনী ব্যক্ত করেন। কখনও কখনও যাদুপটেও তাঁদের কাহিনী ফুটে ওঠে। আদিবাসী পরিবারে কারো মৃত্যু হলে পটুয়ারা দ্রুত তাঁর ছবি আঁকেন। ছবি সম্পূর্ণ হলে পটুয়ারা তাঁর চোখের মণিটি বসান না। পটুয়া শিল্পীরা মৃত ব্যক্তির মনি ছাড়া ছবিটি তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেখান এবং বলেন যে মৃত ব্যক্তির আত্মা পরলোকে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ছবিটি দেখিয়ে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার পটুয়ারা

পরিবারকে বলেন যদি তাঁকে অর্থাৎ পটুয়া চিত্রকরকে কিছু উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়, তবে মৃত ব্যক্তির ছবিতে চোখের মণি বসিয়ে দেবেন বা এঁকে দেবেন। মণি বসিয়ে দিলে মৃত ব্যক্তি তাঁর পথ খুঁজে নিতে পারবে। সহজ-সরল আদিবাসী সমাজ চিত্রকরের এই কাহিনী বিশ্বাস করে এবং পটুয়া চিত্রকরকে তাঁর পারিশ্রমিক দিয়ে খুশি করে চোখের মণি আঁকিয়ে মৃত ব্যক্তির চিত্রটি সম্পন্ন করে নেয়।[১০] আবার গাজীপটের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এটি মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিষয়ক পট। ইসলাম ধর্মে গাজী, ফকির, পীর শ্রেনীর মানুষের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ ফুটে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ায় ও পার্শ্ববর্তী নদীয়ার করিমপুর ব্লকের উপরও পীর, দরবেশ, গাজী, ফকিরদের প্রভাব খুব বেশি। তবে ইসলামী পট হলেও এই শ্রেণীর পটে ব্রাহ্ম দেবতা দক্ষিণ রায় এবং বনবিবির ছবি দেখা যায়। এই পটচিত্র মুসলমান সমাজে মুর্শিদাবাদ জেলায় বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বর্তমান বিনোদন দুনিয়া ধীরে ধীরে ধার্মিক পটচিত্রকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তবে হিন্দু সমাজ মূলত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, রাধা-কৃষ্ণ লীলা, মনসা মঙ্গল, চৈতন্য লীলা প্রমুখ বিষয়গুলিকে নিয়ে পটচিত্রের অনুসারি। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী বা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমময় জীবন, ভালবাসার শক্তি, চৈতন্যের মানব প্রেম, ভেদাভেদহীন সমাজের কথা পটশিল্পীরা তাঁদের তুলিতে জীবন্ত করে তুলেছেন।[১১]

আধুনিক পটুয়া গবেষক কৌশিক বড়াল ও পট শিল্পী প্রসেনজিৎ পটুয়ার মতে মুর্শিদাবাদ জেলায় পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী পটুয়া সমাজকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়।[১২] যেমন- ক) চিত্রকর পটুয়াঃ এরা পট আঁকেন এবং গান বাঁধেন। খ) বেদে পটুয়া - এরা সাপ খেলা দেখান। গ) মিস্ত্রি পটুয়াঃ এই শ্রেণীর পটুয়া পুতুল ও প্রতিমা প্রস্তুত তৈরী করেন। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণর ঝিল্লি এলাকায় এঁদের বেশি দেখা মেলে। ঘ) বান্দুরে পাটুয়াঃ এরা বাঁদর নিয়ে খেলা করেন এবং ঙ) ভাইলাকি পটুয়াঃ এরা মূলত ভাল্লুক নিয়ে খেলা দেখান।

তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় একসময় বান্দুরে পটুয়া ও ভাইলাকি পটুয়াদের দেখা মিললেও বর্তমানে তাঁদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই জেলার পটুয়ারা তাঁদের পটচিত্র অঙ্কনে বেশ কিছু পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে। পটচিত্রের জন্য জমি বা পট তৈরীর জন্য প্রথম পর্যায়ে চট ব্যবহার করা হত। এই চটের উপর গোবর, মাটি দিয়ে লেপ দিয়ে শুঁকিয়ে নিতে হয়। তারপর এর উপরে বেস রং হিসেবে সাদা রঙের ব্যবহার করা হয়। ধীরে ধীরে পরবর্তীতে হাতে তৈরী খণ্ড খণ্ড কাগজে ছবি এঁকে পরে সেগুলি জোড়া দিয়ে অসংখ্য কাগজের খণ্ড তৈরী হত। এগুলি লম্বা কাপড়ের উপর আঠার সাহায্যে এঁকে নেওয়া হত। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়ারা অনেকক্ষেত্রেই যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের উপরে পটচিত্র এঁকে নেন। এই পটচিত্র আঁকার জন্য পটুয়ারা বেশিরভাগ সময়ে নিজেরাই রং তৈ্রী করে নেয়। কখনও কখনও রং তৈরীর আদিম পদ্ধতি তাঁরা ব্যবহার করতেন। তবে বর্তমানে তাঁরা রং তৈরির ঝামেলায় যান না। বাজার থেকেই রং কিনে আনেন। ফলে পটুয়াদের বর্তমান চিত্রগুলি এই কারণেই হয়ত বেশিদিন টেঁকসই হয়না। মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়াগণ লাল রং তৈরী করে গিরিমাটি বা সিঁন্দূর থেকে। বর্তমানে জেলার একাংশ পটুয়ারা জবাফুল, রাঙা মাটি ও বেল আঠা মিশিয়ে লাল রং তৈরী করে। কখনও আবার পুঁই শাকের পাকা ফলের রসের সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে বেগুনি রং তৈরী করা হয়। তবে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাল ও নীল মিশিয়ে বেগুনি রং তৈরী করা হয়। কালিচুনের সাথে কাঁচা হলুদ ও বেলের আঠা মিশিয়ে গেরুয়া রং তৈরী করা হত। কখনও আবার গিরিমাটির গুঁড়োর সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে গেরুয়া রং তৈরী করা হয়।[১৩] হলুদ থেকে হলুদ রং পাওয়া যায়। খয়ের রং-এর সাথে আলা মাটির মিশ্রণে খয়েরি রং তৈরী করা হত। কালো রঙের জন্য হাঁড়ির ভুষাকালি ব্যবহার করা হয়। পট তৈরীর জন্য মাটির হাঁড়ি, খুঁড়ি বা নারকেলের মালাই ব্যবহার করা হয়। পটুয়াদের রং তুলি তৈরি হয় ছাগলের ঘাড়ের লোম, পেটের লোম, কাঠবেড়ালির লোম এবং বেজির লেজের চুল থেকে। অর্থাৎ পটচিত্র তৈরির রং ও তার উপকরণ বেশিরভাগই প্রাকৃতিক।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে এখনও মোটামুটি পটচিত্র লোক-শিল্প হিসেবে বেঁচে আছে। তবে মুর্শিদাবাদের পটশিল্প ও পটুয়াদের উপস্থিতি আজ প্রায় প্রশ্নের মুখে। জনগণনায় পটুয়াদের অবহেলিত জনগোষ্ঠী পটিদার বা পটুয়া হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে বর্তমানে জেলার অনেক পটুয়া তপশিলি জাতিভুক্ত। কয়েক বছর আগেও মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা পট দেখিয়ে ও পট গান শুনিয়ে দক্ষিণা স্বরূপ উপার্জন করলেও বর্তমানে আর তা

হয় না। জেলার পটুয়াগণ জীবিকা হিসাবে শুধুমাত্র এই লোকশিল্পকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারছে না। বিশেষ ঋতুতে, সময়ে তাঁরা পটচিত্র ও পট গান গেয়ে জীবন ধারণ করলেও বছরের বেশিরভাগ সময় শ্রমিকের কাজ, চাষবাস ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং অতি সাম্প্রতি পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়ে সংসার জীবন পালন করে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পটশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পটুয়াদের সরকারি অনুদান, মেলার ব্যবস্থাপনা, তাঁদের উৎসাহ প্রদান ও আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা করছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়াদের অভিযোগ যে তাঁরা সরকারি অনুদান তেমন কিছুই পান না। ১৯৯৬ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত West Bengal Commission For Backward Class' নামক কমিশনের পঞ্চম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াদের মোট সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় আছে পাঁচ হাজার। তবে এখন এই সংখ্যা দুই-আড়াই হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মোট পটুয়া সংখ্যার ৩% মুর্শিদাবাদ জেলায় বাস করে। জেলার সব পটুয়াদের নাম নথিভুক্ত নেই। আবার এরা অন্যান্য পেশার সাহায্যেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা অনুযায়ী চিত্রকর বা পটুয়া পদবী অনুযায়ী এঁদের সংখ্যা জেলাতে বর্তমানে ১৮০০ জন।[১৪] তবে মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জেলায় মাত্র ১৮ জন নিবন্ধকৃত পটশিল্পী রয়েছেন।[১৫] এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খড়গ্রাম থানার নোনাডাঙ্গা অঞ্চলের ঝিল্লি গ্রামের অজয় পটুয়া, বিজয় পটুয়া, রাজকুমার পটুয়া প্রমুখগণ। কাঞ্চন চিত্রকর (রঘুনাথগঞ্জ, গণকর, সাঁওতালপাড়া) বাসুদেব মণ্ডল (শক্তিপুর, পাঠকপাড়া), মহুয়া সরকার (কান্দি, কলাবাগান), তরুণ দাস (কান্দি, জেমো, রঘুনাথপুর), গোবিন্দ হালদার (কান্দি, চামনগর), সুদীপ চক্রবর্তী (ফারাক্কা, পলাশী), সুরেন্দ্রনাথ দাস (রঘুনাথগঞ্জ, গোডাউইন কলোনি) সহ জামির পটুয়া, বুলবুল পটুয়া, সঞ্জীব পটুয়া, বিপাশা পটুয়া, আপেল পটুয়া, বিরিঞ্চি পটুয়া, টুম্পা সিনহা, সৌরেন্দ্রনাথ দাস, গোপাল পটুয়ার মত অনেক পটুয়ারা বর্তমানে জীবন জীবিকার সংগ্রামে পটশিল্পকে প্রায় ত্যাগ করতে বসেছেন।

সরকারি নিবন্ধকৃত না হলেও মুর্শিদাবাদ জেলার আরও বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পটুয়া পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পুলকেন্দ্র সিংহ তাঁর "আত্ম পরিচয়ের আবর্তে পটুয়া সমাজ" ঝড় পত্রিকায় প্রকাশ করে জেলার বিভিন্ন গ্রামে পটুয়াদের উপস্থিতির কথা জনিয়েছেন। এই পত্রিকায় জানানো হয়েছে খড়গ্রাম ব্লকে ঝিল্লি নোনাডাঙ্গা গ্রামে ২০ ঘর, আওগ্রামে ১১ ঘর, আয়রা গ্রামে ৯ ঘর, ভরতপুর থানার আমলাই গ্রামে ৭ ঘর, রঘুনাথগঞ্জের গণকর ৫ ঘর, কান্দির গোকর্ণে ৮ ঘর, সালারের দক্ষিণ খণ্ডে ২২ ঘর, সোনাবন্দিতে ৩ ঘর, বড়ঞা থানার মাজদিয়ায় ৫ ঘর, পাঁচথুপিতে ১০ ঘর এবং কাতুর করবেলিয়াতে ১০ ঘর পটুয়া আছে।[১৬] কৌশিক বড়াল তাঁর 'মুর্শিদাবাদের পট' গ্রন্থে পটুয়াদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র তুলে ধরে বলেছেন কান্দি মহকুমায় বড়ঞা থানার বিপ্রশেখর গ্রামে পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঁতুর গ্রামে মোট ৪০ ঘর পটুয়া আছে। যাদের মধ্যে ৯জন শুধুই পটচিত্র আঁকেন ও পটের গান করেন। ২২ জন পটুয়া কেবল পটের গান করেন, ২০ জন আবার সাপ খেলা দেখান। এদের মধ্যে ৫ জন পশু চিকিৎসক এবং ২ জন শিক্ষকের পেশায় নিয়োজিত। তবে বাকিরা দিনমজুরের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এই গ্রামের পটুয়াদের সাথে কথা বলে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে যে, বর্তমানে এখানে ১৭০ জন পটুয়া আছেন। জেলার এই গ্রামের পরিচিত পটুয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আনু পটুয়া, বিরিঞ্চি পটুয়া প্রমুখ। ইনাদের মতানুসারে বর্তমানে কেউ কেউ রাজমিস্ত্রি, দিন-মজুর, ছোট ব্যবসায়ী, সাপুরে প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত। তবে গোকর্ণ গ্রামে ৪২ ঘর পটুয়া পরিবারে এখনও ২০০ জনের বেশি সদস্য রয়েছেন। তবে এই গ্রামের কেউই আর পেশা হিসেবে পট আঁকেন না। এখানে মাত্র ৫ জন পটুয়া যথা- অচিন্ত্য পটুয়া, প্রসেনজিৎ পটুয়া, মিঠু পটুয়া, মমতা পটুয়া এবং লাবনী পটুয়া- এরাই শুধুমাত্র পট আঁকেন। ক্ষ্যাপা পটুয়া বলে একজন পটের গান করলেও জীবন ধরণের উপযোগী উপার্জন এতে হয় না। তবে গোকর্ণের পটুয়া পরিবারগুলো আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে দ্রুত সমাজের উপরে আসার চেষ্টা করছে। এই গ্রামে বর্তমানে ২০ জন শিক্ষক ২জন ডাক্তার, ১ জন ইঞ্জিনিয়ার, ১২ জন পশু চিকিৎকের উপস্থিতি উন্নত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিচয় দেয়। তবে এখনও বেশিরভাগ অংশই দিনমজুর, রং-মিস্ত্রি ও কৃষকের কাজই করে। রঘুনাথগঞ্জের গণকর গ্রামের কাঞ্চন চিত্রকর পটুয়া এখনও পটচিত্র এঁকে ও পটের গান করলেও গ্রামে আর কোন

পটুয়া চিত্রকর নেই। পটুয়াদের বেশিরভাগই এখন প্রতিমা তৈরীর কাজ করেন। খড়গ্রামের ঝিল্লি গ্রামের ১৪০ জন পটুয়ার মধ্যে মাত্র ১০ জন পট আঁকেন ও ২ জন পটের গান করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি, দক্ষিণখণ্ড, আয়রা প্রভৃতি এলাকাতেও কিছু পটুয়া পরিবার দেখা যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক আঙ্গিকে বর্তমান ব্যবস্থায় পটশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সংকটের সম্মুখীন। পটুয়া পরিবারের সদস্যদের পট ব্যতিরেকে অন্যান্য কাজে যুক্ত হওয়ার কাহিনী প্রমাণ করে অর্থনৈতিক দৈন্যতাকে। রং-মিস্ত্রি, প্যান্ডেল বাঁধার কাজ, দিন-মজদুর, রাজমিস্ত্রি, চাষের কাজ করে পটুয়া পরিবারের আর্থিক দুর্দিন না ঘুচলেও জেলার এই পটুয়ারা একটি উৎকৃষ্ট লোক-শিল্পের ধারক ও বাহক। পট দেখিয়ে, পটের গান শুনিয়ে দিনে ভিক্ষা বৃত্তির মত মাত্র ৪-৫ কেজি চাল বা সাকুল্যে ৪০-৫০ টাকা উপার্জন করা যায়। এই অল্প আয়ে সংসার চালানো অসম্ভব বলেই পটুয়াগণ অন্য পেশা খুঁজে নিচ্ছে। তাছাড়া জেলার মানুষদের সাথে পার্শ্ববর্তী বর্ধমান, মালদা, হুগলী, নদীয়া, বীরভূমের সাধারণ মানুষের কাছে এই লোকশিল্পকে পৌছে দেবার স্বার্থে যে সরকারি উদ্যোগ দরকার তাও দেখা যায় না। তাছাড়া সামাজিক মুল্যবোধের জায়গা থেকেও পটশিল্পীরা যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন অথচ ভিন্ন ধর্মের ঐশ্বরিক মহত্ব প্রচারের ফলে তাঁরা সমাজে অপাঙ্কতেয় হয়ে পরে আধা হিন্দু, আধা মুসলমান হিসেবে। পটুয়া নারীরা শাঁখা-সিঁদূর পরিধান করে আবার মুসলিম রীতি অনুযায়ী নামাজ পড়ে, মৃতদেহ কবর দেয় এবং মুসলিম রীতি অনুসারে বিবাহ করে। অর্থাৎ দুই ধর্মের কেউই এদের আপন করে নিতে পারে নি। তবে পটুয়া নারীরা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন, নিজেদের পচ্ছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করতে পারে এবং বর্তমানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে সরকারি, বেসরকারি কাজও করতে পারে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, পেশা পরিবর্তন করে, অর্থনীতির হাল কিছুটা ঘুরছে। পটুয়াদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার তপশীলি উপজাতি শংসাপত্র দেওয়ায় এরা সমাজে কিছু কাজ খুঁজে নিতে পারছেন। পটশিল্পের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন, ভবঘুরে লোক শিল্পীরা এককালে এই সব গোটানো পট বগল দাবা করে ঘুরতেন এবং সহজ-সরল গ্রামবাসীকে তা খুলে দেখিয়ে গান গেয়ে, বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনা করে জনগণকে আকৃষ্ট করতেন। তবে পরিবর্তিত সামাজিক তরঙ্গ, নতুন পেশ্যর আহ্বান, আর্থিক স্বচ্ছলতার হাতছানি পটুয়াদের অন্যান্য লাভজনক বৃত্তি গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে।[১৭] বর্তমান সমাজে টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল, সিনেমা, ইন্টারনেট 5g যুগে বিনোদন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হচ্ছে। ফলে পটচিত্র শিল্পকে সাদরে গ্রহণ করার মত রুচিবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে। পটকে নিয়ে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের অন্যুৎসাহ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা পটুয়া ও পটশিল্পকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

Reference :

১. সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, ডিস্ট্রিক সেনসাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ সিরিজ ২০, অংশ ১২ এ, ২০১১, পৃ. ৪৭
২. দত্ত, গুরু সদয়, পটুয়া সঙ্গীত, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৯, পরিচারিকা অংশ
৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা থেকে লোক সংস্কৃতি, তৃতীয় মুদ্রণ, দিল্লী, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃ. ১২৬
৪. সাক্ষাৎকার : নাম কঙ্কন চিত্রকর, বয়স-৬৩, গ্রাম- গণকর, ব্লক- রঘুনাথগঞ্জ-১, মুর্শিদাবাদ, তাং- ০৩ /০৬/ ২০২৩
৫. সেন, দীনেশ চন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, ২০১৮, কোলকাতা, পৃ. ৪৪১
৬. দত্ত, গুরু সদয়, পটুয়া সঙ্গীত, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কোলকাতা, ১৯৩৯, পরিচারিকা অংশ
৭. ঘোষ, ডক্টর বারিদ বরণ, পটুয়া সংগীত, কোলকাতা ১৯৯২, পৃ. ১৫
৮. ভট্টাচার্য, অশোক, বাংলার চিত্রকলা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আক্যাদেমি, কোলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৯১, ৯২, ৯৩

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. বড়াল, কৌশিক, মুর্শিদাবাদের পট, জে. কে. বুক, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২১

১৩. সাক্ষাৎকার : দীপালী চিত্রকর, বয়স- ৫৩, গ্রাম, গণকর, ব্লক- ব্লক- রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, তাং- ০৩/০৬/২০২৩

১৪. ভারতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত, ভোটার তালিকা, ০১.০৪.২০২৩

১৫. মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ০৪.০৭.২০২৩

১৬. সিংহ, পুলকেন্দ্র, ''আত্ম পরিচয়ের আবর্তে পটুয়া সমাজ', ঝড় পত্রিকা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মে ২০১৯

১৭. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কোলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০০